‘বালক’ বিবেকানন্দ

স্বামী একচিত্তানন্দ

ক্যালিফোর্নিয়ার আলামেডা থেকে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে (১৯০০ সালের ১৮ এপ্রিল) স্বামীজী বলেছেন, ‘‘জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি...।’’[১]

কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মে অগণিত অবতারের কথা আমরা শুনি। তাঁদের মহিমান্বিত যৌবনের অমর গৌরবগাথা ‘অযুত কণ্ঠে’ কীর্তন করে চলি, পাশাপাশি সীমাহীন মুগ্ধতায় শ্রবণ করি তাঁদের মাধুর্যমণ্ডিত বাল্যলীলার কাহিনিও। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ‘মর্যাদা-পুরুষোত্তম’, তাঁর রাবণবিনাশ ও লঙ্কাবিজয়ের ঘটনামালা আমাদের রোমাঞ্চিত করে, অভিভূত করে, মাথা অবনত হয় শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, ভক্তিতে। কিন্তু এই ভক্তিতে আছে ভীতির সংশ্লেষ, আছে ঐশ্বর্যের বন্দনা। অথচ এই দাশরথি যখন শিশু রামলালা হয়ে আসেন আমাদের কাছে, তখন মনে হয় তিনি সকলের একান্ত আপনজন, প্রীতি আর সোহাগের ধন। ‘লীলাপুরুষোত্তম’ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়দেশে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন পূজার পবিত্রতম বেদিতে। মানবধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চরিত্রে। তিনি সর্বকালের, সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী, প্রশাসক, আচার্য, বেদান্তবিদ, ধর্মসংস্থাপক। তবু, এই সমস্ত অভিধা ও গুণরাশির সমন্বিত রূপ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকে যখন চিন্তা করি, তখন তাঁর সঙ্গে যেন আমাদের একটি অলঙ্ঘ্য দূরত্ব রচিত হয়। আমাদের প্রাণ ব্যাকুলভাবে চায় এই ব্যবধান দূর করতে। বাসনার পরিতৃপ্তিলাভ হয় মা যশোদার নয়নের মণি, গোপীজনবল্লভ বালগোপালের সাহচর্যে এসে। সে-অর্থে শান্ত, দাস্য বা সখ্যভাবের সাধনা যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে বাৎসল্যরসের আস্বাদনে।* প্রেমের মাত্রাগত

---

* প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নির্ণয়—‘পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়’ (মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)। শান্তের গুণ—নিষ্ঠা, দাস্যের গুণ—সেবা (+নিষ্ঠা), সখ্যের গুণ—সমপ্রাণতা (+নিষ্ঠা+সেবা), বাৎসল্যের গুণ—মমতা (+নিষ্ঠা+সেবা+সমপ্রাণতা)।

বিচারে তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, অবতারের বালকমূর্তিটিই সর্বসাধারণের কাছে বেশি আকর্ষণীয়, অনায়াসে উপলভ্য ও বরণীয়। আর সে-কারণেই পরিণত অবস্থায় ঈশ্বরপ্রেরিত দেবমানবের মানুষী লীলার অন্তরালেও আমরা তাঁর বালক সত্তাটিকেই খুঁজে বেড়াই।

আসলে শুধু অবতারপুরুষেরা নন, স্বামীজী বলছেন, সৃষ্টিকর্তা নিজেই স্বরূপত যেন একটি বালক। স্বামীজীর এই অভিমতের সমর্থন রয়েছে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি মন্ত্রে ('লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্', ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩), যেখানে সৃষ্টিকার্যকে পরব্রহ্মের 'লীলাভিনয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিধাতার এই খেয়ালি চরিত্র স্বামীজী দুটি চিঠিতে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। প্রথমটি ২ অক্টোবর ১৮৯৩ শিকাগো থেকে অধ্যাপক রাইটকে উদ্দেশ করে লেখা। চিঠিটির শেষাংশে 'অধ্যাপকজী'র সন্তান অস্টিনকে স্বামীজী বলছেন, ''যখন তুমি খেলা কর, তখন তোমার সঙ্গে খেলা করে যান আর এক খেলুড়ে, যাঁর থেকে আর কেউ তোমাকে বেশী ভালবাসেন না।... কখনো মস্ত মস্ত গোলা নিয়ে তিনি খেলা করেন, যেগুলোকে আমরা বলি পৃথিবী বা সূর্য। কখনো খেলেন তোমারি মতো ছোট ছেলের সঙ্গে, হেসে হেসে খেলে যান কত রকমের খেলা।''[২] লন্ডন থেকে ৬ জুলাই ১৮৯৬ ফ্রান্সিস লেগেটকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতেও একই সুরের অনুরণন : ''তিনি [ঈশ্বর] আমার সদালীলাময় আদরের ধন, আমি তাঁর খেলার সাথী। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না–সব তাঁর খেলা; সব তাঁর খেয়াল। কোন্ কারণে তিনি আবার যুক্তির দ্বারা চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎ-নাট্যের সব অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করছেন।... ভারি মজা, ভারি মজা!''[৩]

'বিরাট শিশু' আর তাঁর 'খেলাঘর' নিয়ে স্বামীজীর এই মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী—যাঁদের প্রতীতিতে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বত অভিন্ন বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত—তাঁদের মনে 'নর-নারায়ণের' মরলীলায় ব্যক্ত বালকভাব নিয়ে প্রশ্ন জাগা খুব স্বাভাবিক। প্রশ্নটি এই কারণেও প্রাসঙ্গিক যে, মর্ত্যভূমিতে নরেন্দ্রনাথের অবতরণ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যে-অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা আমাদের জানিয়েছেন, তাতে 'অখণ্ডের ঘরের ঋষি' নরেন্দ্র হয়েছেন 'দিব্যশিশু'র সহচর।

শিশু নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, পরহিতচিকীর্ষা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সংগীত ও শিল্পকলায় অনবদ্য পারঙ্গমতা, নেতৃত্বদানে সহজাত অধিকার—আমাদের বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। কিন্তু তার পাশাপাশি তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটি দিক প্রবলভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্য, যার নেপথ্যে ছিল তাঁর স্বাধীনতাপ্রীতি—জাগতিক বিষয়ে তাঁর চরম উদাসীনতা আর ধ্যানতন্ময়তা।

সিমলেপল্লীর 'নন্দদুলালের' সঙ্গসুখ লাভের জন্য প্রতিবেশীরা সকলেই লালায়িত। কারণ, সকলকেই সমানভাবে আত্মীয় করে নিতে জানেন তিনি। পাত্রাপাত্র ভেদবুদ্ধি নেই এতটুকু। কারও কোলে বসতেই বিলে নারাজ নয়। আবার কারও কাছে মুহূর্তের জন্য বাঁধন মানতেও প্রস্তুত নয় সিংহশিশু। ভুবনেশ্বরী দেবী জানিয়েছেন, নরেনকে বশে আনতে দু-দুজন ঝি রাখতে হয়েছিল তাঁকে।[৪]

খেলার মাঠে নরেন নামেন রাজা হয়ে। দুহাতের মুঠো খুলে সর্বস্ব বিলিয়ে দেন নির্বিচারে। পরনের নতুন কাপড় তুলে দেন ভিখারির হাতে। বালকের কোনও কিছুতেই মমত্ববুদ্ধি নেই ছিঁটেফোঁটা। প্রাপ্তির ঘরে তো শুধু আনন্দ!

এ শুধু ছেলেবেলার গল্প নয়। পরিণত বয়সে বিবেকানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে একদিন শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন : ''আমি মায়ার

সঙ্গে খেলা করছি। যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে—এই খেলা ছেড়ে দেব।"[৫] পশ্চিমের অনুগামিনীদের অন্যতম ভগিনী ক্রিস্টিন স্মৃতিকথনে বলছেন, ''স্বামীজী ছটফট করতেন। এক দুরন্ত অস্থিরতা তাঁকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। সেটা লক্ষ করে কেউ কেউ বলতেন : 'উনি বড় চঞ্চল, বড়ই চঞ্চল।' কিন্তু এই ছটফটানি নির্বোধের ছটফটানি নয়।... তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। নিজের আত্মা সম্পর্কে, আপন দৈবী সত্তা সম্পর্কে তিনি নিত্য সচেতন ছিলেন। আর সচেতন ছিলেন বলেই দেহটা তাঁর কাছে হাড়মাসের খাঁচা, এক জঘন্য যন্ত্রণা, এক নিদারুণ বন্ধন বলে মনে হত। বনের সিংহকে খাঁচায় পুরে রাখলেও সে কি অরণ্যের মুক্ত জীবনকে কখনও ভুলে থাকতে পারে? পারে না।... স্বামীজীর অবস্থাও ছিল তদ্রূপ।"[৬]

ভুলে থাকতে পারতেন না বলেই খেলায় অংশ নিয়েও যখন খুশি খেলা থেকে মন তুলে নিয়ে মুক্তির আনন্দকে খুঁজে বেড়াতে পারতেন। কী কৈশোরে, কী বা যৌবনে—সর্বাবস্থায়।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ। নিউইয়র্কে মিস এমা থার্সবির বাড়িতে আছেন স্বামীজী। একদিন এক প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মযাজকের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ হল দীর্ঘকাল। সঙ্গী মিসেস ওলি বুল এতে একটু বিরক্ত হলেন। স্বামীজীকে উপদেশ দিলেন—বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। একই সুরে সুর মিলিয়ে চিঠি লিখলেন মিস মেরি হেল। উত্তরে অগ্নিবর্ষণ করে স্বামীজী ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫-এর চিঠিতে স্পষ্ট জানালেন : ''আমার হৃদয়ে যে সত্যের বাণী শুনতে পাচ্ছি, তাতে কান না দিয়ে কেন আমি বাইরের লোকের খেয়াল অনুসারে চলব?... মানুষের মন যোগানোর সময় আমার নেই। এ করতে গেলেই আমি ভণ্ড হয়ে পড়ব।... জেলিমাছের মতো জীবন কাটিয়ে নির্বোধ মানুষের চাহিদা মেটাতে পারব না।"[৭]

আসলে চাহিদা তো নিজের দিক থেকে ছিল না কিছুমাত্র। বিদ্যা-বুদ্ধি-পদ সবই ছিল পিতার। ছিল ধনজন-প্রতিপত্তি। জায়মান শৈশবে উত্তরসূরিকে প্রশ্ন করলেন বিশ্বনাথ দত্ত, ''বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?" উত্তর এল নির্বিকার, ''সহিস কিংবা কোচোয়ান।"[৮] বিত্ত-মান-বংশমর্যাদা চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারল না। 'বিলে'র দৃষ্টি অনাবিল।

করতে পারল না, কারণ নরেন্দ্র তুলনাহীন সারল্যের ঘনীভূত মূর্তি। শুনেছেন, হনুমান কলাবনে থাকেন। তাই অটল ধৈর্য নিয়ে, আশায় বুক বেঁধে কলাগাছের ঝোপে থাকেন প্রতীক্ষারত। বাড়ির কোচোয়ান বলেছে—বিয়ে করা খুব নিন্দনীয়। সঙ্গে সঙ্গে তাতে ধ্রুব বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, অনতিবিলম্বে প্রাণাধিক প্রিয় রামসীতার বিগ্রহ বিসর্জন।

এই অমায়িক সারল্য নিয়ে নরেন্দ্র এসে পৌঁছেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারপ্রান্তে। বালকের জিজ্ঞাসা সেখানে বড় অদ্ভুত সরল : ''আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" প্রশ্নের উত্তর আসে—ততোধিক সরল। মরপৃথিবীর ধূলিকণা রোমাঞ্চিত হয় অমরলোকের অনুভূতির আশ্বাসনে।

বালকের ভালবাসা শর্তহীন। শ্রীরামকৃষ্ণ একমাস নরেনের সঙ্গে কথা বললেন না। তারপর একদিন প্রশ্ন করলেন, ''আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটি কথাও কই না, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস বল দেখি?" কোনও রাখঢাক না করেই অকপট নরেন্দ্র বললেন, ''আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছা করে, তাই আসি।"[৯]

স্মরণীয়, কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, ''বালক গুণাতীত,—কোন গুণের বশ নয়।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বশ মেনেছিলেন নরেন, 'গুণের' কাছে নয়।

কাশীপুর থেকে তারক আর কালীপ্রসাদের সঙ্গে নরেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করেছেন। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''সে কোথাও যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে।''[১১]

নরেন ফিরে এসেছিলেন। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর জাগতিক অর্থে প্রাপ্তির কিছু ছিল না। মাকে কাছে পেলেই বালক পরিতৃপ্ত, সে শুধু চায় তাঁরই সঙ্গসুধা!

অকাল পিতৃবিয়োগের পর প্রবল আর্থিক অনটনের মুহূর্তে মা-ভাইদের অন্নকষ্টের জ্বালা সইতে না পেরে নরেন শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন : কিছু একটা করে দিতে হবে। মঙ্গলবারের নিশায় 'পাগলা বামুন' তাঁকে পাঠালেন ভবতারিণীর মন্দিরে। বালক নরেন্দ্র মায়ের কাছে গিয়ে বারবার করলেন একই ভুল। টাকাকড়ি, চাকরিবাকরির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চেয়ে বসলেন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, মায়ের নিত্য অবারিত দর্শন।

মায়ার দরজা পেরিয়ে নরেন প্রবেশ করলেন মায়ের ভুবনে।

মা তো একই! গর্ভধারিণী, ভবতারিণী, দেশজননী, সঙ্ঘজননী—বিবেকানন্দের মননালোকে মিলেমিশে একাকার।

পাশ্চাত্য থেকে দেশে ফিরে এলেন 'বিশ্ববিজয়ী' বালক-বীর। দর্শন, প্রণাম করতে গেলেন গর্ভধারিণীকে। মায়ের কোলে মাথা রেখে সরল অসহায় শিশুর মতো কেঁদে কেঁদে বললেন, ''মা, তোমার নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দাও, মা! আমায় বড় করে তোলো, মা!''[১২]

মায়ের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতাই বিবেকানন্দ নামধারী সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর।

'খ্যাপা ছেলে' একদিন দেখা করতে গেছেন মা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে। প্রাণের সাধ—মায়ের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরী দেবীর দিবাহার সেদিন সবে শেষ হয়েছে। স্বামীজী খুব হতাশ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলেন—পাশে পড়ে আছে সজনে-ডাঁটার একটা ছিবড়ে। স্বামীজী তা-ই মুখে তুলে নিলেন। 'মায়ের প্রসাদ' যে![১৩]

বলরাম মন্দিরে আর একদিনের ঘটনা। স্বামীজী আছেন, আছেন রাজা মহারাজও। দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজী। তাঁর মায়ের এক পরিচারিকা স্বামীজীকে দর্শন করতে এসেছেন। রাজা মহারাজ জানালেন—স্বামীজী বিশ্রাম করছেন। পরিচারিকা ফিরে গেলেন। ঘুম ভাঙার পর স্বামীজী খবর পেয়ে রাজা মহারাজকে খুব বকাঝকা করলেন ডেকে না দেওয়ার জন্য। কালবিলম্ব করলেন না আর। গাড়ি ভাড়া করে চলে গেলেন ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছে। ভেবেছিলেন, মা বুঝি তাঁকে কোনও দরকারে ডেকে পাঠিয়েছেন। গিয়ে শুনলেন, তা নয়। বালক বিবেকানন্দ তখন আবার গাড়ি পাঠিয়ে সিমলেপাড়ায় ডেকে আনলেন 'অভিন্নহৃদয়'কে। ক্ষমা চাইলেন নিঃশেষে।[১৪]

সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের কাছেও নরেন্দ্র ধরা পড়েন বালকমূর্তিতেই। ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯। আঁটপুরে আছেন শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, বাবুরাম মহারাজ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। শ্রীশ্রীমাকে কাছে পেয়ে স্বামীজীর আনন্দ যেন বাঁধনহারা। ইতিমধ্যে মালপত্র এসে পড়ল সব। তার মধ্যে একটি মোট বেশ একটু বড়। সকলের বিছানা বাঁধা রয়েছে তাতে। মোটটি নামানো মাত্র স্বামীজী আনন্দভরে বালকের মতো ওটিকে ঘোড়া করে উঠে বসলেন। ছেলের আনন্দে মায়েরও আনন্দ। লক্ষ্মীদিদি লক্ষ করলেন, শ্রীশ্রীমা হেসে চলেছেন অবিরাম।[১৫] ঠিক যেন একটি মা আর তার শিশুছেলের গল্প।

সারল্যের আলোয় উদ্ভাসিত, পবিত্রতার বর্মে ভূষিত এই বালক পরিব্রাজক জীবনেও নিজেকে গোপন করে রাখতে পারেননি।

স্বামীজী হরিপদ মিত্রের বাড়িতে আছেন। দুপুরে বিছানায় শুয়ে একদিন একটি বই নিয়ে পড়তে

পড়তে জোরে হেসে উঠলেন। শুনে উৎসুক হরিপদবাবু ঘরের দরজায় এসে দেখলেন, স্বামীজী নিবিষ্টমনে পড়ে চলেছেন, আর কোনও কাজে দৃষ্টি নেই। প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেলে স্বামীজীর 'সম্বিৎ' ফিরে এল। হরিপদবাবুকে বললেন, ''যখন যে কাজ করতে হয়, তখন তা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার সঙ্গে করতে হয়।''[১৬]

মাইসোরের মহারাজ চামরাজেন্দ্র উদীয়ার প্রধান অমাত্যকে ডেকে বললেন স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে বাজারের সেরা দোকানটিতে ঘুরে আসতে, আর স্বামীজী যা চান তা-ই তাঁর হাতে তুলে দিতে। স্বামীজী এলেন, দেখলেন, তারিফ করলেন, কিন্তু কিছু চাইতে পারলেন না। শেষমেষ অমাত্যের মান রাখার জন্য বেছে নিলেন বারো আনা দামের একটা চুরুট![১৭]

নাছোড় চামরাজেন্দ্র স্বামীজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন রোজউডের একটি হুঁকো। সেটি সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজে এসে স্বামীজী উঠলেন মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে। হুঁকোটি বাড়ির পাচকের নজরে এসেছে। সে সেদিকে তাকিয়ে আছে। চোখভরা কৌতূহল। স্বামীজী ভাব বুঝে জিজ্ঞেস করলেন : ''তোমার কি এটা চাই?'' উত্তরের অপেক্ষা না করেই নির্মায় সন্ন্যাসী হুঁকোটি তুলে দিলেন পাচকের হাতে।[১৮]

আসলে স্বামীজীর চিন্তায় 'আমার' বলে তো কিছু নেই, সবই যে 'মা'-র। পরবর্তী কালে রচিত 'অম্বাস্তোত্রে' স্বামীজী লিখছেন : ''সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা।''

শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্যোগপর্বে দক্ষিণি অনুরাগীরা অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সকলের প্রাণের সাধ—সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁদের নয়নের মণি বিবেকানন্দ। কিন্তু জগজ্জনীর 'বালক' তাঁর ইচ্ছে না জেনে পাড়ি জমাতে চান না।

সে-ইচ্ছে পূরণ হয়েছিল—আমরা জানি।

কিন্তু জাগতিক, বৈষয়িক বিষয়ে বালক বিবেকানন্দের চরম ঔদাসীন্য (বিশেষত যখন তা তাঁর ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত) তাঁর জীবনের উত্তরাঙ্কে কী গভীর সংকটের কারণ হয়েছিল, সে-সংবাদ আজ সর্বজনবিদিত। এত বড় ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য শিকাগো এলেন, অথচ সঙ্গে নিয়ে এলেন না কোনও পরিচয়পত্র। এর যে কোনও প্রয়োজন হতে পারে—এ-ভাবনা তাঁর চিন্তাতেই স্থান পায়নি।

চিন্তায় তো রয়েছে শুধু স্বদেশ—অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে নিপীড়িত তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি। ধর্মমহাসভায় প্রথম দিনের অধিবেশনের শেষে সংবর্ধিত হয়েও নিমেষে তাই পরিত্যাগ করতে পারলেন 'প্রচারকে'র সত্তা। পালঙ্কের শয্যা তাঁর কাছে কাঁটা হয়ে উঠল। দুঃখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন প্রবল আর্তনাদে।

ধর্মমহাসভার ঠিক পরে পরেই 'বালক বীর'কে আবিষ্কার করল 'Boston Evening Transcript'। পত্রিকায় লেখা হল : ''নিজের ভাবরাশির চমৎকারিত্ব ও আকৃতির প্রভাবে তিনি মহাসভায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি শুধু মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে অগ্রসর হলেই করতালিতে অভিনন্দিত হন। হাজার হাজার লোকের এই বাঁধভাঙা প্রশংসায় তিনি কিছুমাত্র গর্ব প্রকাশ না করে শিশুর মতো পরম সন্তোষের সঙ্গে তা গ্রহণ করে থাকেন।''[১৯]

'Hindoo monk'-এর 'ঝোড়ো' মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সদাহাস্যময় 'বালক'টিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন পশ্চিমি বন্ধুরা।

প্রত্যক্ষ করেছিল শিকাগো লিঙ্কন পার্কের নাবালিকা মেয়েটিও। ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরে পরেই প্রাতর্ভ্রমণের সূত্রে স্বামীজী যখন এলেন তার সামনে—'বিশ্ববিজেতার' উষ্ণীষ খুলে—তাঁকে 'বন্ধু' বলে চিনে নিতে তার অসুবিধে হয়নি কিছুমাত্র।

২৬২ নং মিশিগান অ্যাভিনিউ, শিকাগো। ধর্মমহাসভা চলছে। মি. জে বি লায়নের বাড়িতে

সানফ্রান্সিসকো, ১৯০০

স্বামীজী অতিথি হয়ে আছেন। লায়ন-দৌহিত্রী মিসেস কর্নেলিয়া কোঙ্গার উপহার দিয়েছেন এই দিনগুলির একটি অনবদ্য স্মৃতিচিত্র : ''তিনি যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, তখন লোকেরা তাঁকে ভারতের কাজের জন্য টাকা দিত। তাঁর টাকার থলি ছিল না; তাই তিনি রুমালে বেঁধে এসব নিয়ে আসতেন—ঠিক যেন সাফল্যগর্বিত বালক! ঘরে এসে তা দিদিমার কোলে ঢেলে দিতেন হিসেব রেখে দেওয়ার জন্য। দিদিমা তাঁকে বিভিন্ন মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আর ওগুলো গুনে কী করে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখতে হয় তা শিখিয়ে দেন। স্বামীজীর শ্রোতারা যাদের সাহায্য করছেন, তাদের না দেখলেও এমনভাবে অর্থ তুলে দিচ্ছেন দেখে স্বামীজী খুব আশ্চর্য হতেন।''[২০]

ধর্মমহাসভার উত্তরপর্বে কী বিপুল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় স্বামীজীকে—সে-খবর আজ সকলেরই জানা। তবু এরই মাঝে লেখা চিঠিগুলিতে তাঁর নিস্পৃহ যোগিসত্তা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, মহানন্দে গেয়ে উঠেছে বন্ধনমোচনের গান। ২৬ জুলাই ১৮৯৪ সোয়ামস্কট থেকে হেল-বোনেদের কাছে লেখা একটি চিঠিতে মূর্ত হয়েছেন 'বালক বিবেকানন্দ' : ''তোমরা ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছ তো? বেশ হয়েছে, গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছ। আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠান্ডা! যখন ভাবি তোমরা চারজনে গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কী তোফা ঠান্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা!''[২১] অন্য একটি চিঠিতে লিখছেন : ''লোকে আমাকে বলে 'ঝোড়ো (সন্ন্যাসী)'। আসলে আমার প্রকৃতি তার ঠিক বিপরীত।''[২২]

শুধু হেল-বোনেদের সঙ্গে নয়, আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কা সমস্ত মায়ের সান্নিধ্যেই 'বিব্ কানন্দ' যেন এক সরল বালক। মিসেস বেটি লেগেট বলেছিলেন : ''সারা জীবনে আমি দুজনমাত্র জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির দর্শন পেয়েছি, যাঁদের সামনে মানুষ আত্মমর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ মনে চলাফেরা করতে পারে—একজন ছিলেন জার্মান সম্রাট কাইজার, অন্যজন স্বামী বিবেকানন্দ।''[২৩] মিশিগানের বিদুষী অনুরাগিণী মিসেস ব্যাগলি একটি চিঠিতে লিখেছেন : ''তাঁকে চিনতে পারলে আর তাঁর সঙ্গে একই ঘরে বাস করার সুযোগ পেলে যেকোনও লোকের জীবন উন্নততর হতে বাধ্য।''[২৪] প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি,

ভাগবতের মহাশুদ্ধা গোপীরা যমুনায় স্নান করতে করতে 'শ্রুতি-স্মৃতি-পালনকর্তা' ব্যাসদেবকে দর্শন করে সংকুচিতা হয়েছিলেন। হননি তাঁর পুত্র—মূর্তিমান পবিত্রতা—বালক শুকদেবকে দর্শন করে।

স্বাভাবিক পবিত্রতার অভিব্যক্তি ঘটত দুভাবে। 'রণং দেহি' মূর্তিতে যিনি হতেন 'বজ্রের চেয়ে কঠোর', অবস্থান্তরে তিনিই আবার অবলীলাক্রমে হতে পারেন কুসুমের চেয়েও মৃদু।

সিস্টার ক্রিস্টিন স্মরণ করছেন : তর্কযুদ্ধে স্বামীজীকে হারানোর সাধ্যি ছিল না কারও। যুক্তি দিয়ে 'কালো'কে 'সাদা' প্রমাণ করায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে এইভাবে বলত, ''স্বামীজী, আপনার সঙ্গে তর্ক করার সাহস আমার নেই, কিন্তু আপনি তো জানেন, এটা সত্য''—তক্ষুনি স্বামীজীর চোখেমুখে এক অবিশ্বাস্য কোমলতা ফুটে উঠত। তিনি সম্মত হয়ে বলতেন, ''হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।''[২৫]

জ্ঞানের আবরণে আবৃত কোমলহৃদয় শিশুটিকে দর্শন করেছিলেন ভগিনী হরিদাসী—মেরি সি ফাঙ্কি। সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থানকালে শেষের দিনটিতে 'তরুতলবাসী' স্বামীজীর ধ্যানমগ্ন মূর্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ফাঙ্কির। সহকারীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ধ্যানভঙ্গ হলে চোখ মেলে ব্যথার্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে শিশুটিকে বলতে শুনেছিলেন : ''আমি কি আবার কলকাতার বর্ষার মধ্যে এসে পড়লুম নাকি!''[২৬]

স্মৃতিচারণায় হরিদাসী লিখছেন : ''শেষ দিনটায় তাঁর হাবভাব যেন শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিল। এত কোমল! এত মধুর! বিদায়বেলায় তাঁর স্টিমার নদীর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে স্বামীজী মাথার টুপিটা উৎফুল্ল কচি ছেলের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে বারবার নাড়াতে লাগলেন।''[২৭]

'কচি ছেলে'কে চিনতে পেরেছিলেন মড স্টাম। বিবেকানন্দ-সূর্যের দিগন্তপ্লাবী বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হয়েছেন তিনি বারবার, কিন্তু তাঁর প্রাণহরণ করেছেন আড়ালের সরল, অকপট 'বয়স্ক শিশু'টি, যিনি মধ্যাহ্নভোজের পর বেটি লেগেটের আইসক্রিম সেবনের আমন্ত্রণে সাড়া দেন বাধ্য শিশুর মতো, আর আনন্দঝরনার উৎসমুখ খুলে যায় তাঁর নয়নে-আননে।[২৮]

স্বামীজী নিশ্চিতভাবে জানেন—আনন্দই তাঁর স্বরূপ! ৬ জুলাই ১৮৯৬ মি. ফ্রান্সিস লেগেটকে চিঠিতে তাই লিখলেন, ''... সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু!... এ যেন জগতের খেলার মাঠে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সকলে চেঁচামেচি করে খেলা করছে! তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি করব, কাকে নিন্দা করব? এসবই যে তাঁর খেলা!''[২৯]

অদোষদর্শী বিবেকানন্দের অমল চরিত্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি রয়েছে, তাঁরাই জানেন—এ স্বামীজীর 'মরমের কথা'। নিন্দাস্তুতিতে সমবুদ্ধি ছিলেন বলেই অপবাদের বিপুল সমুদ্রকে গোষ্পদ জ্ঞান করতে পেরেছেন হেলায়। জয়-পরাজয়—বালকের চোখে—সবই যে 'তাঁর' খেলার অঙ্গ!

পশ্চিম থেকে ঘরে ফিরে এলেন 'বিশ্ববিজয়ী' বিবেকানন্দ। অনুরাগীদের মনে একরাশ কৌতূহল—স্বামীজী কি আগের মতোই আছেন? তাঁদের সকলের প্রতিনিধি হয়ে সদানন্দজী প্রশ্ন করলেন, ''কি মহারাজ, আর কি আমাদের মনে আছে?'' হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন 'জ্যোতির তনয়' : ''সেকি রে গুপ্ত, আমি কি ঘোড়ার ডিম হয়েছি যে, তোকে মনে থাকবে না!''[৩০]

মনে ছিল। মান-যশের সাঁড়াশি আক্রমণে আনন্দ-সত্তার তো কোনও বিকার ঘটে না!

বলরাম-ভবনে আছেন স্বামীজী। সঙ্গী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) চিনি-মেশানো নেয়াপাতি

ডাবের খোলে বরফ দিয়ে খেতে দিয়েছেন। খেয়ে স্বামীজী ভারি খুশি। এত খুশি হলেন যে, কৃষ্ণলাল মহারাজের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মুখে তুলে নিলেন তাঁরই এঁটো। বালকভাব—শুচি-অশুচি ভেদবুদ্ধি নেই।[৩১]

পর্দা ফাঁক হয়ে গেল ক্ষীরভবানীতে মাতৃমন্দিরে এসে। আচার্য-প্রচারকের উপাধি খসে পড়ল। মায়ের দর্শনের শেষে বজরায় ফিরে এসে স্বামীজী বললেন, ''আমার যা কিছু ছিল, সব গেছে। এখন কেবল 'মা মা'।... মা আমাকে বললেন, ''তুই আমাকে রক্ষা করিস? না আমি তোকে রক্ষা করি?''... আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছু নেই, আমি এখন ছোট শিশু।''[৩২]

'মায়ের শিশু' ফিরে এলেন কলকাতায়, প্রতিষ্ঠা করলেন 'শ্রীমঠ', কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নিলেন দ্রষ্টার আসনে। মঠের প্রশাসনযন্ত্রের পরিচালনভার অর্পণ করলেন গুরুভাইদের হাতে।

ইতিমধ্যে মহামারী প্লেগ সজোরে আঘাত করল শহর কলকাতাকে। সেবাকাজ শুরু করতে হবে। টাকা কোত্থেকে আসবে? স্বামীজী বললেন, ''কেন? দরকার হলে নতুন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রি করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?''[৩৩] বালকের কোনও কিছুতেই আঁট নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় : ''(বালক) এই খেলাঘর পাতলে কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল; মার কাছে ছুটেছে।''[৩৪]

অনন্তের অভিসারী বিবেকানন্দ বাঁধা পড়লেন না প্রাণাধিক প্রিয় গুরুভাইদের মায়াতেও। মহাপ্রস্থানের মুখে সবাইকে ছড়িয়ে দিলেন দিগ্‌বিদিক।

মায়ের চরণে পৌঁছল সন্তানের সকরুণ প্রার্থনা : ''খেলা মোর হল আজি শেষ, শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দাও, মুক্ত আজি কর মা আমারে!''

ভেঙে গেল শৃঙ্খল। পড়ে থাকল একান্ত আপন 'বালক-সত্তা', যে 'বাঘা-হংসী-মটরু'র সঙ্গে খেলায় খুঁজে পায় প্রাণের স্ফুর্তি, সাঁওতাল-নারায়ণের উপাসনায় পায় পরম পরিতৃপ্তি, আহিরীটোলার ঘাটে শিষ্যের সঙ্গে চানাচুর-ভাজা ভাগ করে খেয়ে পায় অবিমিশ্র আনন্দ!

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ লিখেছেন, ''বালকের মতো তাহা (চানাচুর ভাজা) খাইতে খাইতে (স্বামীজীকে) আগমন করিতে দেখিয়া শিষ্য অবাক।''[৩৫]...

অবাক—বাক্‌স্তব্ধ হল পৃথিবীও। ৪ জুলাই ১৯০২।

মহাসমাধির প্রাক্‌কালে সেবককে আদেশ করলেন ঘরের বাইরে বসে ধ্যান করতে।

তখন রাত নটা। মালা হাতে শুয়ে আছেন স্বামীজী। একবার কেঁপে উঠল ডান হাত, নির্গত হল গভীর নিঃশ্বাস। বালিশ ছাড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল মাথা। মাঝে দু-মিনিট সময়ের ব্যবধান। নিঃশ্বাস পড়ল আর একবার। তারপর সব স্থির। গম্ভীরানন্দজীর ভাষায় : ''যেন একটি ক্লান্ত শিশু মায়ের কোলে বিশ্রামলাভ করল।''[৩৬]

অতীতে একদিন এই রণক্লান্ত বালকের মুখচ্ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন মড স্টাম। পারেননি। নিজের ব্যর্থতার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণায় : ''...হলঘরের সবুজ গদিমোড়া পালঙ্কে টানটান শুয়ে ক্লান্ত এক শিশুর মতো স্বামীজী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।... একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর প্রশান্ত মুখের রেখাগুলি কী সরল, সুন্দর!... আঁকতে গিয়ে দেখলাম কাজটা কত কঠিন!''[৩৭]

আমাদেরও মনে হয়—স্বামীজী মানববুদ্ধির অগম্য। যুগনায়ক হয়েও তিনি যুগাতীত, দেশনায়ক হয়েও তিনি দেশহারা, জ্ঞানমূর্তি হয়েও তিনি 'ভক্তিং

বৃতবরবপুঃ', 'অখণ্ডের ঘরের ঋষি' হয়েও 'দিব্যশিশু'র লীলাপার্ষদ। সরল বালকবেশে ধরা দিতে এসেও তাই তিনি বারবার হেসে চলে যান দেশকালের সীমার ওপারে। এই 'অধরা মাধুরী'র অন্বেষণেই বিবেকানন্দ-প্রেমিকের জীবনভর সাধনার সার্থকতা। ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), পৃঃ ৭২৩ [এরপর, *পত্রাবলী*]

২। তদেব, পৃঃ ৮৯

৩। তদেব, পৃঃ ৪৬৭

৪। স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহিগণ, *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, ভাষান্তর : স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩), পৃঃ ২০৯ [এরপর, *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*]

৫। সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১), পৃঃ ১০৭ [এরপর, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*]

৬। *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, পৃঃ ২৭৬

৭। দ্রঃ *পত্রাবলী*, পৃঃ ২৯৫

৮। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ২৮ [এরপর, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*]

৯। তদেব পৃঃ ১১৬

১০। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, অখণ্ড (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), পৃঃ ৭৪৯

১১। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, পৃঃ ১৫৫

১২। *The Brahmavadin*, 16/7, July 1911, p. 306

১৩। Swami Tathagatananda, *Vivekananda's Devotion to His Mother Bhuvaneshwari Devi* (Advaita Ashrama: Kolkata, 2012), p. 33

১৪। দ্রঃ স্বামী প্রভানন্দ, *ব্রহ্মানন্দচরিত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ২৭৯

১৫। সংকলক ও সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১), খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৯৩

১৬। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ৭৩-৭৪

১৭। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০৫

১৮। তদেব, পৃঃ ৩২৬

১৯। দ্রঃ তদেব, খণ্ড ২, পৃঃ ৩২

২০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৯

২১। *পত্রাবলী*, পৃঃ ১৭১-৭২

২২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৫

২৩। দ্রঃ *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩১-৩২

২৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১২৩

২৫। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, পৃঃ ২৬১

২৬। তদেব, পৃঃ ৩২১

২৭। তদেব, পৃঃ ৩২১-২২

২৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৩৬

২৯। দ্রঃ *পত্রাবলী*, পৃঃ ৪৬৭-৬৮

৩০। *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, পৃঃ ২৯

৩১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৭৯

৩২। দ্রঃ *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩৭

৩৩। তদেব, পৃঃ ৮৬

৩৪। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, অখণ্ড, পৃঃ ৯৩০

৩৫। দ্রঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১), পৃঃ ২৫৮

৩৬। দ্রঃ *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩৭৬

৩৭। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৩৩৭